সুখ গাছের গল্প

ঝুমুর পাণ্ডে

আজ সকাল থেকেই জঞ্জালিদের মরা নিম গাছে কাকগুলো ডাকছে। একটা নয় দুটো নয়, চার পাঁচটা কাক। ডানা ঝেড়ে গা দুলিয়ে ডাকছে তো ডাকছেই.....

''বলি হেই লবাব লেড়কা তু উঠবিস কি নাই? ঘণ্টি বাজল সব মানুষ কামে গেল ঘুমায় ঘুমায় গান বাজাচ্ছে। বন্দ করতো যন্তরটা।'' রামবাসিয়া হাত-পা নেড়ে রাগে গজ গজ করতে করতে ঝাঁট দেয়। মাথা তুলে একবার মড়া গাছটার দিকে, একবার কাকগুলোর দিকে তাকায়। আবার ঝাঁট দেয়। সারা উঠোন। নাতি লক্ষীন্দরের যন্তরটা এখন আরও জোরে জোরে শব্দ ছড়ায়। সারা উঠোনময় ঘুরে বেড়ায় প্রথম গানের কলি ''চোরি চোরি চুপকে চুপকে''। আহারে কি গানের ছিরি। ছিল আগে গানের মতন গান। নাতিকে এখন শুনিয়ে শুনিয়ে বলে রামবাসিয়া। একবার সেই মাহুত প্রেমিকের সঙ্গে হাইলাকান্দি শহরে গিয়ে সিনেমা দেখেছিল 'মোঘলে আজম'। আনারকলির জন্য সেদিন অনেকের সাথে কেঁদে ভাসিয়েছিল রামবাসিয়াও। আর কি গান 'প্যার কিয়া ত ডরনা কিয়া'। কতদিন রামবাসিয়া গরু খেদাতে খেদাতে জঙ্গল থেকে কাঠ আনতে আনতে, বাসন মাজতে মাজতে গলা ছেড়ে জোরে জোরে গেয়েছে গানটা। গলাটা অবশ্য তখন ভালই ছিল রামবাসিয়ার। আর হয়তো ওই গানটা গাইতে গাইতেই মাহুতের প্রেমে আরও বেশি করে মজে গেছিল রামবাসিয়া। মাহুতটা এসেছিল চন্দ্রমণি সার্কাসের হাতির মাহুত হয়ে। সকাল বেলা মাহুতগুলো হাতিগুলোকে নিয়ে কলাগাছ খাওয়াতে রামবাসিয়াদের ঘরের ধার ঘেঁষেই জঙ্গলের দিকে যেতো। এমনি একদিন বাপের জন্য ক্ষেতে চা নিয়ে যেতে যেতে কালো একহারা মাথাভর্তি চুলের মাহুতটাকে দেখে রামবাসিয়া ভুলে গেল সব। তারপর এক স্বপ্নের নদীতে হাবুডুবু। নিরন্তর। সার্কাসটা একসময় খেলা শেষ করে চলে গেল। মাহুতটা কিন্তু রয়েই গেল। রামবাসিয়ার টানে? হ্যাঁ রামবাসিয়ার পেটে তখন হাত পা ছুঁড়ছে মাহুতের বেটা লক্ষীন্দরের বাপ ভরত। রামবাসিয়ার বাপের তখন মাথায় হাত। ভিনদেশী ছেলেটার সাথে কেমনে দিবে শাদি? তবু সমাজের হাতে পায়ে ধরে এক কিয়ার জমিন বেইচে শাদি রচাল বাপ। কিন্তু শাদির দিনই বেপাত্তা হয়ে গেল মাহুতটা। প্রথম প্রথম খুব কাঁদত রামবাসিয়া। তার বাদে আর কাঁদত না। দুচোখ থেকে আগুন বেরত। খুঁজে পেলে মনে হত কেটে টুকরো-টুকরো করে ফেলবে মাহুতটার অস্থি, মাংস, মজ্জা। কিন্তু তবু ভুললো আর কোথায়? চা-পাতা তুলতে তুলতে কত দিন থেমে গেছে হাত। পদ্মপুকুরের পাড়ে কতদিন বসে থেকেছে চুপচাপ। রাতে চোখের জলে ভিজে গেছে শিথান। বিয়ে করতে তখন এগিয়ে এসেছিল কীর্তন গাইত অজিত, জঞ্জালির বাপ বিকাশ আর যাত্রায় মেয়ে সাজত সুভাষ। কিন্তু রাজি হয়নি রামবাসিয়া। মানুষের প্রতি তখন কেমন ঘেন্না ধরে গেছিল।

—তোকে হামি লিয়ে যাব।

—লিয়ে যাবিস?

—হুঁ রে শাদি করে লিয়ে যাব।

কত স্বপ্ন দেখাত মদেশীয়া মাহুত যুবক। মা মরতে মায়ের পাতি তোলায় কাজটা পেয়ে গেছিল তাই রক্ষে।

—হামার দেশে জানিস শাল আছে মহুয়া আছে।

—পাহাড় আছে?

—আছে আছে। তোকে মহুয়ার ফুল খাওয়াব।

—ও থায় করম লাচ হয়রে? -আরও ঘন হত রামবাসিয়া।

—হয় হয়। তোকে লিয়ে লাচব সারারাত।

মাহুতটার দেশে নয়। এখানেই করমের জাগরণে মাহুতটার সঙ্গে নেচেছিল সারারাত। কত টিটকিরি, কত আড় চোখে কথা। সব কলঙ্কই তখন রামবাসিয়ার কাছে পদ্মফুলের মালা। আবার ঝাঁট দেয় রামবাসিয়া। ঝাড়ুটার বাঁশ গুলো বেরিয়ে গেছে। বসে বসে ঠিক করে। যাঃ চুলটা খুলে গেল। শনের মত কয়েক গাছি চুলকে বড় কেরামতি করে বাঁধে রামবাসিয়া। কতদিন তেল পড়েনি। আগে সারা মাথা ভরে কত চুল ছিল। সোনার মত চুল। বাবুর বেটি মন্দাকিনী কতদিন বলেছে ''তোর কি সুন্দর সোনালি চুল। একেবারে ইউরোপিয়ানদের মত।''

—মানে?

—মানে আবার কি সাহেবদের মতন।

হাসত রামবাসিয়া। তবে কী রামবাসিয়া...? রামবাসিয়ার কিন্তু বাবুর বেটির মত কালো চুলই ছিল পছন্দ। মন্দাকিনীর সঙ্গেই ৩৮৪ নং চালমার্স প্রাইমারি বিদ্যালয়ে চারটা পাশ দিয়েছিল রামবাসিয়া। ছিল তখন ভরত মাস্টার। ইস্কুলে না গেলে ছাত্র পাঠিয়ে কান ধরে নিয়ে যেত। তাইতো এখনও চারটা পাশ দিয়েই রামায়ণ, মহাভারত, পদ্মপুরাণ গড় গড় করে পড়তে পারে রামবাসিয়া। লক্ষীন্দর তো আটটা পাশ দিয়েছে। পড়ুক তো রামবাসিয়ার মত। তার বাদে কলকাতায় চলে গেল মন্দাকিনী। কত না জানি পাশ দিল। এখন কোথায় লাতি পুতি লিয়ে কেমন আছে কে জানে? নাকি কোন কাম কাজও করছে। সেবার যখন আকাল হল। কালো কানুনের ঠেলায় চাল যখন প্রায় লা পাতা হল। মানুষ জঙ্গলের আলু তুলে তুলে শেষ করল। কাঁচা কাঠাল, লাউ, কুমড়াও মানুষ খুদ মিশিয়ে সেদ্ধ করে করে খেল। তার বাদেই হল মড়ক। জঞ্জালির মা, ঠাকুমা, দুটা ভাই তিনটা বোন একদিনে সাবাড় হয়ে গেল। জঞ্জালি কাঁদতেও ভুলে গেল। রামবাসিয়ার পিসি কিষ্টমণি বুড়িকে তখন লোকে ডায়েন বলে তাড়াল। ঠিক তখনই নাকি একবার মন্দাকিনী এসেছিল। কিন্তু রামবাসিয়ার সাথে আর দেখাই হল না। রামবাসিয়া তখন সইকে দেখতে চলে গেছিল ঝালনাছড়ায়। একঝাঁক মৌমাছি এসে

লিচু গাছের মুকুলে বসল। রামবাসিয়া এখন ঝাড়ুটা রেখে বসে বসে উঠোনের ঘাস গুলো খুঁটে খুঁটে তোলে। জামগাছে একটা হলদে পাখি ডাকল ইষ্টিকুটুম। কিন্তু কাকগুলোর চেঁচামেচিতে আবার উড়ে গেল।

ঝরনার উপরেই পাহাড়। এই পাহাড়টাই মিশে গেছে ছাতাচূড়ায়। ঝরনাটার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছে চলতা গাছের সারি। দুটো বনমোরগ কি খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। উড়ে গেল একটা তিতির। একটা বনকবুতর গলা ফুলিয়ে ডাকছে তো ডাকছেই...''এখানে দাঁড়া তো রামবাসিয়া''।

রামবাসিয়ার সোনালি চুল তখন হাওয়ায় উড়ছে। আঁটসাঁট শরীরে স্থির হয়ে আছে অষ্টাদশ বসন্ত। উঁহু ঐরকম না ঝরনার দিকে মুখ করে।

ছোটবাবুর ঘরে কোত্থেকে একজন শিল্পী এসেছিল। কত ছবি আঁকত। রামবাসিয়ারও দুটো ছবি এঁকেছিল। ছবি আঁকতেও শিখিয়েছিল রামবাসিয়াকে, পচাকে ছোটবাবুর ছেলেটাকে। ভরতের তখন দুবছর বয়েস। সমাজটার সঙ্গে লড়তে বলত মানুষটা। বদলাবার কথা বলত। তাই না রামবাসিয়া সব কিছু ভুলে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। বড় ভাল ছিল গো মানুষটা। সেবার ভোটের সময় যখন দেদার পয়সা ঢালছিল সুভাষবাবুর দল। কাম কাজ ছেড়ে মদে ভাসছিল বাচ্চা, বুড়ো, জোয়ান। মারামারি, লাঠালাঠি লেগেই ছিল। তখন ওদের রুখতে রঙ-তুলি ছেড়ে পথে বেরিয়েছিল লোকটা। ঘাস খুঁটতে খুঁটতে রামবাসিয়া এখন সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর আকাশের দিকে তাকাল কিছুক্ষণ। বসলেই কোমরটা আজকাল ধরে যায়। চোখটা এখন আকাশ থেকে সরে এলে উঠোনের আমগাছে। মুকুলে মুকুলে ছয়লাপ আমগাছটার মাথায় এখন সোনা রঙের রোদ। কমলা টিলার উইনচেস্টার গির্জার মাথায়ও সকালের একডালা রোদ। লুসাইরা উইনচেস্টার সাহেবকে কেটে যখন ওর মেয়েকে নিয়ে গেল তখনই নাকি রামবাসিয়ার বাপের বাপের জনম হয়েছিল। কমলা টিলার উপরেই ছিল সাহেবের বাংলো। পানিওয়ালা এসে খবর দিয়েছিল ''সাহেব লুসাই আসছে।'' কিন্তু সাহেব সাজগোজ না করে নামবে কী করে? তাই সাহেব ড্রেস করতে লাগল। মেম সাহেবটা চালাক ছিল ছেলেটাকে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে পালিয়ে গেল। সাহেব মেয়েটাকে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে যখন নামল তখন ঠিক টিলাটার নীচে যে কাঠের পুলটা আছে ঠিক ওইখানে লুসাইরা নাকি কচাকচ কেটে ফেলল সাহেবটাকে।

এসব কথা রামবাসিয়ার সব ঠাকুমার মায়ের কাছে শোনা। ঠাকুমার মা নাকি তখন স্বচক্ষে সব দেখেছিল। রামবাসিয়া ছেলেবেলায় টিলাটায় অনেক ঘোরাঘুরি করেছে। গাছ থেকে কমলা পেড়ে খেয়েছে। আর এই তো কয়েক বছর আগে টিলাটার উপর লুসাইরার এসে ক্ষমা চেয়ে প্রেয়ার করল। তখন অবশ্য গির্জাটা হয়নি। 'যন্তরটা বন্দ কর নারে।' আবার চেঁচায় রামবাসিয়া। আবার ঘাস খুঁটে। আবার ঝাঁট দেয়। আবার খুঁটে। দুদিন আগেই ঘাসগুলো পরিষ্কার করল আবার গজিয়ে গেল। ধুত্তোরি।

লিচু গাছের মুকুল থেকে রস নিয়ে মৌমাছিগুলো এখন উড়ে গেল। বাপের পোঁতা লিচু গাছটাতে এবারই মুকুল এসেছে। সেবার টুসু পরবের দিন সবাই যখন টুসুকে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরছে। বাপও ছিল ওদের সাথে। ছোট বাবুর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে গাইছিল মেয়েরা—

ছোট বাবুর ভাঙা ঘরে
ভূতে ঢেলা মাইরেছে
কে দেইখেছে কে দেইখেছে
জনার বেটি দেইখেছে.....

আর ঠিক তখনই বাপ রাস্তার ধারের কচু জঙ্গলে উল্টে পড়েছিল। পরবের জন্য একটু খেয়েছিল কি না। ওই যে পড়ল আর উঠল না বাপ। বাপের মা রামেশ্বরীর কাছে ওই ঘটনার কথা কতবার শুনেছে রামবাসিয়া। বিশেষ করে টুসু পরবের দিন বসে বসে বুড়ি কাঁদত। হলদে পাখিটা আবার এসে ডাকল ইষ্টিকুটুম। চমকে উঠল রামবাসিয়া।

ধলেশ্বরীর শুনশান ঘাটে কাঠের পিঁড়িতে ধপাধপ কাপড় কাচছে রামবাসিয়া। বালির উপর হাটছে দুটো পাখি। আকাশে একটা নিঃসঙ্গ চিল। বড় একা। মাথার উপর টকটক করছে সূর্য। তবু গান করতে করতে কাপড় কাচছে রামবাসিয়া। আগের দিন রাতে যাত্রা দেখেছিল 'সাগরভাসা', ঐ পালার গানগুলোই সুর করে গাইছে। আর তখনই খবর পেল রামবাসিয়া বেটা ভরত কাউকে কিছু না বলে ডায়মণ্ড সার্কাসের সঙ্গে চলে গেছে। তবে কি বাপের খোঁজে গেল? নাকি রক্তে বইছে মাহুত বাপেরই ধারা। নইলে বৌ বাচ্চা ছেড়ে....

এমনিই রামবাসিয়ার কপাল ছ'মাস না যেতে বউটাও মরল বাচ্ছা বিয়োতে গিয়ে। নাতি লক্ষীন্দর তখন এত্তো ছোট, শুধু মা বাপ ডাকে। আনাড়ি ধাইটাই মারল বউটাকে। এমনি তো হরদম এখানে বাচ্চা বিয়োতে গিয়ে কচি কচি বউগুলো মরে। কিন্তু ভরতের বউটার জন্য বড় দুঃখ পেয়েছিল রামবাসিয়া। মনটা বড় ভাল ছিল বউটার। রামবাসিয়াকে বড় আদর যত্ন করত। কিন্তু নাতিটা হয়েছে ঠিক উল্টো। রামবাসিয়ার বাগানের পাতি তোলার কাজটা শেষ হতে রামবাসিয়া ঠিক করেছিল নাতিটাকে ঢোকাবে। কিন্তু বেঁকে বসল নাতি লক্ষীন্দর।

—হামি ঐ কাম নাই করব।

—তোখে কোন পাতি তুলতে দিবেক? মরদ দফায় শিকলিঙ করবি নাইলে...

—ঐ এক হইল।

—এক হইল? হামি সাহেব, বাবু, পাঞ্চাইত সবকে বলে বলে ঠিক করলাম।

—হামি বাগানে কাম করব নাই।

—করবিস নাই?

—না।

—তবে বাবুদে মতন নক্‌রি করবি? আটটা পশ দিয়ে নকরি মিলবে তোর?

—না।

—না তবে খাবিস কী? হামি আর কতদিন?

—হামি রেডিও টেপের দোকান দিব।

—দোকান দিবিস?

রামবাসিয়ার চোখ কপালে উঠেছিল।

—টাকা কোথায়?

—কেনে তোর ফান্ডের টাকা নাইলে....

—নাইলে কী?

—নাইলে ক্ষেতের জমিনটা বেচে দিস।

রামবাসিয়া ঐ দিন খুব দুঃখ পেয়েছিল। সেই কবে এদিকে চা বাগানগুলোর যখন পত্তন হয়। আরকাঠিরা ধরে আনল মজুর। তো অনেক বাগানে মজুরদের কাজের সাথে ধান জমিও বিলি করা হয়েছিল। ঐরকম ক্ষেতের জমি রামবাসিয়াদেরও আছে। আর এইতো পিছুধারের জমিনটা যেখানে রামবাসিয়া শাকসবজি বুনতো। গতবার নাতিটার জিদে বিক্রি করতে হল। তারপর নাতি টেপ কিনল। সাইকেল কিনল। এখন রোজ বলে "একটা টিভি কিন গো টিভি।" ভাগ্যিস ফাণ্ডের টাকাটা এখনও মেলেনি। পঞ্চায়েত ইউনিয়নের কাছে অনেক হাঁটাহাঁটি করেও। ক্লাবঘরে গিয়ে টিভি দেখে লক্ষীন্দর। টেলিভিশন আছে সুধন্যর ঘরেও। সেবার ইন্দিরা গান্ধীকে যখন মারল তখন সুধন্যর ঘরে তিল ঠাঁই ছিল না। ঘরের বেড়া বারান্দার বেঞ্চ সব ভেঙ্গে ফেলেছিল মানুষ। তার বাদে যখন রামায়ণ সিরিয়াল শুরু হ'ল তখনও ঐ রকম মানুষ। মানুষ। মানুষ...

রামবাসিয়া নাতি লক্ষীন্দরকে বলেছিল—

'কেলাবঘরে যায়ে তো টিভি দেখিস।'

'কেলাবঘরে যায়ে দেখা আর নিজের ঘরে দেখা এক হল?' বড় খাই বেড়েছে গো লাতিটার।

সই এর নাতনীর সঙ্গে নাতিটার বিয়ে ঠিক করেছিল রামবাসিয়া। কিন্তু নাতিটা বলে কি না—কী কী দিবেক আমাকে?

—দিবেক মানে? হামাদের উ চল নাই।

—তোর জমানা এখন নাই। না দিলে হামি শাদি করব নাই।

—শাদি করবিস নাই?

—না। করব নাই। সুধন্য কাকার বেটাকে কী কী দিয়েছে দেখেছিস?

লজ্জায় সই এর কাছে আর মুখ খুলেনি রামবাসিয়া। এড়িয়ে গেছে কৌশলে। তবু নাতিটাকে কেন জানিনা বড্ড ভালবাসে রামবাসিয়া। বাপের ক্ষেত ছিল। মাও কাম করত। তবু মায়ের ছেঁড়া নিমা কুপি বাতির আলোয় মনসামঙ্গল আর রামায়ণ পড়া তবু কারওর খাই ছিল নাগো। সুখ ছিল গো। সুখ। পূজা-পরবে এত হাসি-খুশি থাকত সবাই। এত হায় হায়, নাই নাই, ছিল না। আগে পুজোয় যাত্রা হত ঢপও হত। বাসন্তী পুজোয় হত রামায়ণ গান। এখন সবাই পুজোর সময় ভিডিও দেখে। নাতিটার সাজ-পোষাক জুতোর বাহার দেখলে হাড়পিত্তি জ্বলে যায় রামবাসিয়ার। ধুর এখন আর কেউ তেমন মনসা গানও করে না। এই ভিটেটা কত কষ্টে আটকে রেখেছে রামবাসিয়া। সুধন্য দালাল কতদিন এসেছে। 'ভিটাটা বেচে দে। বহুত টাকা পাবিস।'

—বাপ দাদার ভিটা বেইচে থাকব কোথায়?

—রিজার্ভের ওইদিকে বহুত জমিন পাবিস সাফ করে বসে থাকিস বাস্।

—খাস জমিন?

—খাস তো কী? বসলে কে উঠায়?

রামবাসিয়া শেষে লাঠি নিয়ে তাড়িয়েছিল।

কি জানি এতে নাতিটারও যোগসাজশ আছে কি না। থাকতেও পারে। মানুষের বড় খাই বেড়েছে গো। বড় খাই বেড়েছে। মনে মনে আবার আওরায় রামবাসিয়া। অশান্তির অর্ঘ্য মানুষ নিজেই সাজিয়েছে। শান্তিদেবী তাই আজ ঘরছাড়া। সুখের গাছটাকেই উপড়ে ফেলেছে গো দামাল ষাঁড়ের দল। দোপাটি ফুলের বীচিতে আর দোপাটি গাছ হয় না। সেই যে রামবাসিয়ার কত ফুল-ফল হারিয়ে গেল। গাঁ বস্তিতে খুঁজে খুঁজেও এখন আর সেগুলো পায় না রামবাসিয়া। জঞ্জালিদের জলজ্যান্ত নিমগাছটা কি করে মরে গেল আহারে নইলে এই চৈত মাসে কচি পাতায় পাতায় সবুজ হয়ে উঠত গাছটা। একবার মরা গাছটার দিকে, একবার কাকগুলোর দিকে আবার তাকায় রামবাসিয়া। ঘাস তোলা ছেড়ে একট লম্বা শ্বাস ফেলতে ফেলতে আবার ঝাঁট দেয়। আজকাল নাকি লোভনীয় সব জিনিস কিনতে শরীর বেচছে গেরস্থ ঘরের মেয়েরাও। ভদ্দর লোকের ছেলেরাও নাকি মুখে কালো কাপড় বেঁধে হাতে রিভলভার নিয়ে ডাকাতি করছে রাতে। আগে পেটের দায়ে করত গো। আর এখন? তাহলে নাতি লক্ষীন্দরও কী?...আঁতকে উঠল রামবাসিয়া। ঝাড়ুটা হাতে নিয়েই পায়ে পায়ে এগোল। এখনও এত বেলা অব্দি পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে এজন্য কি? রাতের বেলা রামবাসিয়া কি আর অতশত খেয়াল রাখে? আস্তে আস্তে এগোচ্ছে রামবাসিয়া যন্তরটা থেকে এখনও গান ছড়াচ্ছে "চোরি চোরি চুপকে চুপকে"। মরা নিমগাছে কাকগুলো এখনও ডাকছে তো ডাকছেই। রামবাসিয়া একবার থমকে দাঁড়ায়। আবার এগোয়। বুকটা ধুকপুক করে। মাটির দেওয়াল জুড়ে শাহরুক খান আর ঋত্বিক রোশন। ঘরভর্তি মাকড়সার জাল। এ মা এইতো নাতিটার শিথানে কালো কাপড়ের টুকরো বিছানা থেকে বেরিয়ে আছে ওটা কি রিভলভারের নল? মাগো মা। দুহাতে মুখ ঢাকে রামবাসিয়া। ত কসরৎ করে বাঁধা চুলটা খপ করে ছড়িয়ে পড়ল পিঠে। ধুপধাপ করে ছুটে আসছে কি পুলিশ?

না—মাথা ঘুরে পড়ছে না রামবাসিয়া। মাকড়সার জাল থেকে বেরিয়ে উপড়ানো সুখের গাছটাকে আবার ঘরের কোথায় পুঁতবে মাথাটা হেলিয়ে এখন তাই ভাবছে রামবাসিয়া....